অবিশ্বাস্য এক হীরক কোহিনুর

ইরাদজ আমিনী

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

লে খ ক প রি চি তি

ইরাদজ আমিনী ১৯৩৫ সালে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তেহরান, অক্সফোর্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পর ইরান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন। ইরানের পরলোকগত শাহ রেজা পাহলভির শাসনামলে তিনি প্রথমে শাহের বোনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিউনিসিয়ায় ইরানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লবের পর তাঁর পক্ষে একবার ইরানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তীতে তিনি নেপোলিয়ন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নেপোলিয়ন এবং পারস্যের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইরাদজ আমিনী প্যারিসে নির্বাসিত জীবন কাটানোর সময় সাংবাদিকতা করেন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পারস্যের স্মৃতি তাঁকে ঘনঘন ভারতে নিয়ে আসে। ভারতের ইতিহাসের ওপরও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভূমিকা

১৮৫০ সালের ২৯ জুন ব্রিটিশ পতাকাবাহী যুদ্ধজাহাজ 'এইচএমএস মেডিয়া' দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে পোর্টসমাউথ বন্দরের এক পরিত্যক্ত জেটিতে নোঙর করে। বোম্বে (মুম্বাই) থেকে জাহাজটি যাত্রা করেছিল ১৯৪৯ সালের ৬ এপ্রিল। নাবিকরা ছাড়া জাহাজে যাত্রী ছিলেন মাত্র দুজন; ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মার্কেস ডালহৌসির এডিসি ক্যাপ্টেন র‍্যামসে এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর সাথে যুক্ত ডালহৌসির লিয়াজোঁ অফিসার লে. কর্নেল ম্যাকেনসন।

'মেডিয়া' যা বহন করছিল তা খুব সহজে কারো পকেটে রেখে নিয়ে যাওয়া যায় এমন একটি ছোট প্যাকেট। বেশ কিছুদিন পর সংবাদপত্রগুলো গোপনীয়তার পর্দা উন্মোচন করে যে, "জাহাজটি যে পণ্য পরিবহন করেছে তা বিখ্যাত হীরক 'কোহিনুর' ছাড়া আর কিছু নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকরা রানি ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেবে জগদ্বিখ্যাত এই 'কোহিনুর' হীরা। এ উপলক্ষে ১৯৫০ সালের ৩ জুলাই বিকেল ৪টায় বাকিংহাম প্রাসাদে আয়োজিত হবে এক অনুষ্ঠান।"

১৮৪৯ সালের ২৯ মার্চ পাঞ্জাবের তরুণ মহারাজা দালিপ সিং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর রাজ্য সমর্পণের চুক্তি সংশোধন করেন। চুক্তির তিন নম্বর ধারায় ছিল যে, বিশ্বখ্যাত হীরক 'কোহিনুর' মহারানি ভিক্টোরিয়াকে হস্তান্তর করতে হবে।

লর্ড ডালহৌসি তাঁর সার্বভৌম রানিকে লিখেন, 'হীরক খণ্ডটি ইত:পূর্বে দিল্লির সম্রাটদের সিংহাসনের শোভা বর্ধন করত, যা পারস্যের নাদির শাহ তাঁর দিল্লি অভিযানের সময় হস্তগত করেন— পরবর্তীতে যেটি হস্তান্তরিত হয় কাবুলের বাদশাহদের কাছে। মহারাজা রণজিৎ সিং আফগানিস্তানের বিতাড়িত বাদশাহ শাহ সুজার কাছ থেকে কোহিনুর হাসিল করেন।' সামগ্রিক ঘটনার প্রেক্ষিতে কোহিনুরকে ব্রিটিশের ভারত জয়ের ঐতিহাসিক এক প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গভর্নর জেনারেল অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে মহামান্যা রানির মুকুটে এটি স্থায়ী স্থান করে নেবে।

কিন্তু বাস্তবে কোহিনুর কখনো ব্রিটিশ রাজা বা রানির মুকুটের শোভা বর্ধন করেনি, সম্ভবত এটি দুর্ভাগ্য বয়ে আনে বলে; যদিও কাহিনি অনুসারে শুধু পুরুষরাই কোহিনুরের কারণে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন। ১৮৫১ সালে লন্ডনে

মহাজাঁকজমকের মধ্যে কোহিনুরের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এরপর এটিকে সুন্দর আকৃতিতে কেটে রানি ভিক্টোরিয়ার একটি টিয়ারায় বসানো হয় এবং পরে রানি মেরির মুকুটে এবং ১৯৩৭ সালে এটি রাজমাতা রানি এলিজাবেথের মুকুটে স্থান পায়।

'কোহিনুর' এখন আর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর হীরক হিসেবে পরিচিত নয়। 'কুলিনান' বা (দ্য গ্রেট স্টার অব আফ্রিকা, যা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আছে) দ্য 'রিজেন্ট' (যা আছে প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামে) এবং 'ওরলভ' (যা রাখা হয়েছে ক্রেমলিনে) এই হীরকখণ্ডগুলো সৌন্দর্য ও খ্যাতিতে সেরা। কিন্তু অন্যান্য সকল হীরার চেয়ে কোহিনুরকে বিবেচনা করা হয় রোমান্টিক হীরক হিসেবে। কারণ, কোহিনুরের ঠিকরে পড়া ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত, পারস্য, আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ইতিহাসের বর্ণাঢ্য ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনা এবং সেসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাহিনি।

'কোহিনুর' ইংল্যান্ডে পৌঁছার পর অনেক লেখক কোহিনুরের উৎস ও মালিকানা নিয়ে অনুমান-নির্ভর বহু কাহিনি লিখেছেন। অনেকে বলেছেন, এই হীরার অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। অনেকে বলেছেন হিন্দুস্তানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অথবা সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে প্রথম কোহিনুর হীরার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এটি কি মহাভারতের বীর কর্ণ ও অর্জুনের ব্রেসলেটের শোভা বর্ধনকারী সামান্তিক মণির অনুরূপ? নাকি এটি সম্রাট বাবরের হীরা— যা অনেক ইতিহাসবিদ ও খনি বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফরাসি পর্যটক টাভারনিয়ার ১৬৬৫ সাল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে বড় আকৃতির যে হীরক খণ্ড দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, সেটিই কি 'কোহিনুর'?

'কোহিনুর' সম্পর্কে এখনো অনেক কিছু অজ্ঞাত। আমরা ১৭৩৯ সালের পর কোহিনুর সম্পর্কে জানাজানির পর থেকেই শুধু নিশ্চয়তা সহকারে এর ইতিহাস বলতে পারি। যদিও কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতে তৈমুর বংশের অর্থাৎ মোগলদের শাসন শুরু হওয়ার বহু আগেই কোহিনুরের অস্তিত্ব ছিল। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে পাঠককে ফিরে যেতে হবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন কাবুলের বাদশাহ জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর হিন্দুস্তান জয় করেন।

ইরাজদ আমিনী

সূচিপত্র

বাবরের হীরা

প্রথম অধ্যায় ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬
তৃতীয় অধ্যায় ৪৮
চতুর্থ অধ্যায় ৬৬
পঞ্চম অধ্যায় ৮৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৭

কোহিনুর

প্রথম অধ্যায় ১২৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪৩
তৃতীয় অধ্যায় ১৫৬
চতুর্থ অধ্যায় ১৬৭
পঞ্চম অধ্যায় ১৮২
ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৭
রহস্যে ঘেরা কোহিনুর ২১৪

বাবরের হীরা

প্রথম অধ্যায়

'কোহিনুর' কখনো মোগল সম্রাট বাবরের মালিকানাধীনে ছিল না। হয়তো তিনি কোনো এক পর্যায়ে এই হীরাটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু তার নাম সবসময় জড়িয়ে থাকবে প্রবাদতুল্য এই হীরার সাথে। কারণ তিনি তাঁর আত্মকথায় সর্বপ্রথম এই মূল্যবান পাথরটির নাম উল্লেখ করেছিলেন। কোহিনুর হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার বহু আগে থেকে এর পরিচিতি ছিল 'বাবরের হীরক' নামে। তখন তিনি কে ছিলেন?

বাবর শব্দটির উৎপত্তি ফারসি 'বিবর' থেকে, যার অর্থ বাঘ। ১৪৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছোট পার্বত্য রাজ্য ফারগানার রাজধানী আন্দিজানে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন ফারগানার শাসক, যিনি বিখ্যাত বীর তৈমুর লং-এর নাতি। ট্রান্সঅক্সিয়ানার তুর্কি বারলাস বংশের সদস্য। বাবরের মা কুতলাক নিগার খানুম ছিলেন মোঙ্গলিস্তানের খানের কন্যা এবং চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র চাগতাই এর বংশধর। পূর্বপুরুষদের মধ্যে বাবরের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তৈমুর। তাঁকে তৈমুরের বংশধর না বলে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন।

ফারগানা ছিল তিয়ান-শান পর্বতশ্রেণির মাঝে মনোরম এক উপত্যকা জুড়ে বিস্তৃত। উপত্যকার পানির উৎস সির দরিয়া এবং ফারগানার সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো হচ্ছে: উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান এবং একটি পথ চলে গেছে সমরকন্দ পর্যন্ত। ফারগানা একসময় ছিল তৈমুরের সাম্রাজ্যের অংশ, যার বিস্তৃতি ছিল একদিকে আনাতোলিয়া থেকে চীনা তুর্কিস্তান এবং অন্যদিকে হিমালয় থেকে শুরু করে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত। কিন্তু ১৪০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর সে সাম্রাজ্য আর টিকে থাকেনি। বাবরের যখন জন্ম হয়, তখন তৈমুরের ঐতিহ্যের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তার উত্তরাধিকারীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িত কিছুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্য।

ফারগানার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল ট্রান্সঅক্সিয়ানা, যার রাজধানী ছিল অতুলনীয় নগরী সমরকন্দ। বাবরের তিন চাচা শাসন করতেন সমরকন্দ, বাদাখশান ও কাবুল। কিন্তু বাবরের এক চাচাতো ভাই হিরাতের সুলতান হুসাইন-ই-বাইকারা তৈমুর বংশের শাহজাদাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তিনি শিল্প সংস্কৃতির অনুরাগী এবং মেধাবী কবি ছিলেন এবং হিরাতকে তিনি পরিণত করেছিলেন তৈমুর বংশের শাসনের রেনেসাঁর কেন্দ্রে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য হিরাতে সমবেত হয় বিভিন্ন এলাকার শিক্ষিত লোক, কবি, ইতিহাসবিদ, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ ও স্থপতিরা।

ফারগানার উত্তর-পশ্চিম দিকে বসবাস করতেন বাবরের মাতৃপক্ষের আত্মীয়রা, যারা মোঙ্গল বংশের চাগতাই উপজাতির বংশধর। বাবরের এক মামা মাহমুদ খান যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে তাসখন্দ নগরীর ওপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আরেক মামা আহমাদ খান প্রেইরি অঞ্চলের রুক্ষতায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অসম সাহসী যোদ্ধাদের নিয়ে চীনের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

উজবেক প্রভাবিত ভূখণ্ড তাসখন্দের উত্তরে অবস্থিত এলাকার প্রধান মোহাম্মদ শাইবানি খানও চেঙ্গিস খানের বংশধর এবং বাবরের বংশের সঙ্গেও সরাসরি সম্পৃক্ত।

এই পরিবেশে বেড়ে ওঠেন মোগল বংশের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা। বংশগত ও পারিপার্শ্বিক কারণেই তাঁর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানের। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর লিখিত 'বাবুরনামা' এখনো একটি সেরা সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থটিতে তাঁর বর্ণনার সাবলীল প্রকাশ ও কল্পনার সমৃদ্ধিই ফুটে উঠেছে।

১৪৯৪ সালের জুন মাসে যখন তাঁর বয়স এগারো বছরও হয়নি তখন তাঁর পিতা এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে হয়। সিংহাসন বাস্তবিকপক্ষেই কণ্টকাকীর্ণ ছিল। তিনি সিংহাসনে বসেও সারেননি, তখনই তাঁর মঙ্গোলীয় ও তৈমুর বংশের আত্মীয়স্বজনরা তাঁর সিংহাসনের দাবিতে প্রবল আপত্তি সৃষ্টি করে শক্তির নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে।

পরবর্তী বছরগুলোতে বাবর একে একে তাঁর চাচা, মামা ও তাদের পুত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এমনকি নিজের ভাইদের সঙ্গেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। সবশেষে তাঁকে লড়তে হয় উজবেক প্রধান দুর্ধর্ষ শাইবানি খানের বিরুদ্ধে। এসব যুদ্ধ শুধু ফারগানাকে রক্ষা করার উদ্দেশেই ছিল না, তাঁকে

সমরকন্দ দখলের জন্যও যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যে নগরী তিনি দখল করেছিলেন তিনবার— ১৪৯৭, ১৫০০ ও ১৫১২ সালে।

সমরকন্দ এককালে ছিল তৈমুরের মনোরম কাহিনিতুল্য রাজধানী এবং এই নগরী দখলের স্বপ্ন তরুণ বাবরের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে বারবার উদ্যোগ নিতে হয়েছে। বাবরের প্রাথমিক জীবনের বছরগুলোতে তাঁর ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। একদিন তিনি ছিলেন শাহজাদা, পরদিনই তাঁকে হতে হয়েছে যাযাবর। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া তাঁর যোদ্ধাদের আশ্রয় নিতে হয় পর্বতে এবং টিকে থাকতে হয় আশপাশের গ্রামের ওপর আক্রমণ চালিয়ে।

চরম দুর্দশা ও বঞ্চনার এই বছরগুলোতে তিনি তাঁর সমর্থকদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং বন্ধুদের চক্রান্ত সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "তখনো আমার ওপর যাদের আস্থা ছিল এবং আমার সঙ্গে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিল, তাদের সংখ্যা মাত্র দুই থেকে তিনশ'র মধ্যে ছিল। তরুণ এবং বৃদ্ধ। অধিকাংশই বৃদ্ধ, যাদেরকে পথ চলতে হয়েছে অন্য কারো সাহায্য নিয়ে। তাদের পরনে ছিল দীর্ঘ আলখেল্লা এবং পায়ে কাঁচা চামড়ার জুতা। আমরা এত হীন অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম যে, আমাদের তাঁবু ছিল মাত্র দুটি। আমার নিজেরটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম আমার মাকে এবং প্রতিটি যাত্রাবিরতির স্থানে আমার সঙ্গীরা আমার জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে দিত।"

১৫০৪ সালের আগস্টে বাবর বলতে গেলে অনেকটা অলৌকিকভাবে হিরাতের এক সামন্ত প্রধান খুসরো শাহের সেনাবাহিনীকে পান। খুসরো শাহকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'মোটা, বৃদ্ধ, খর্বাকৃতির ব্যক্তি' হিসেবে, যার শক্তি ও সাহস ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং তিনি নিজের বাহিনীকে বাবরের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হিরাত ছেড়ে খোরাসানে চলে যান।

বাবর একসময় হিরাতে আশ্রয় নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। এবার তিনি তাঁর দৃষ্টি ফেরান কাবুলের দিকে। যদিও কাবুল কৌশলগতভাবে পর্বতের এক উচ্চ স্থানে অবস্থিত, কিন্তু সেখান থেকে খাইবার পাস হয়ে ভারত ও পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ছিল। বাবর কাবুলের শাসক মুখিম আরগুনের কাছ থেকে কাবুল দখল করেন, যিনি তার চাচা উলুগ বেগকে হারিয়ে কাবুল কবজা করেছিলেন। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ১৫০৭ সালে বাবর 'পাদশাহ' খেতাব ধারণ করেন। অবশেষে তিনি একটি রাজ্যের মালিক হলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। উজবেক অভিযানের হুমকিতে আবার

তাঁর কাবুল ছেড়ে পলায়নের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ হুমকি শিগ্‌গির কেটে যায় এবং তিনি কাবুলে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তী সময়ে একজন ফরাসি ইতিহাসবিদ ফার্নাল গ্রেনার্ড লিখেছেন, "তাঁর চিত্র দেখে বুঝা যায় যে, দীর্ঘাকৃতির মুখসহ তিনি সুদর্শন, চমৎকার নাসিকা, থুতনির নিচে সরু হয়ে আসা দাড়ি এবং কিছু গোঁফের নিচে তাঁর কঠোর হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোট চোখ দেখে তাঁর পূর্বপুরুষদের নিশানা শনাক্ত করা যায়। কিন্তু পরিত্যক্ত, পর্যুদস্ত অবস্থা তাঁকে বিরাট এক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাবলি— স্বাধীনতা এবং বিরুদ্ধাচরণের চেতনা এ সময়েই বিকশিত হয়েছিল। চারদিকে যখন দুর্ভাগ্যের বাতাস বইছিল, তখন তিনি জানতেন যে, কীভাবে তাঁকে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে, নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকতে হবে এবং সকল প্রতিকূলতার মাঝেও দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে। অর্থহীন প্রতিবাদ করা নয়, বরং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ঝঞ্ঝার মাঝে ভাগ্যের ফসল তুলতে হবে।"

১৫০৮ সালের ৬ মার্চ বাবর কাবুলের দুর্গে জন্মগ্রহণকারী তাঁর প্রথম পুত্র হুমায়ুনের জন্মোৎসব পালন করেন। এ উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করা হয়, যে উৎসবে তিনি প্রথাগত ঐতিহ্য অনুসারে সকল দরবারি ও সভাসদকে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা উপহার দেন।

শিশুটির মাকে বাবর ১৫০৬ সালে হিরাতে বিয়ে করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী ছিলেন। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার হলো, তিনি অথবা অন্য কেউ তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে কোনোকিছু লিপিবদ্ধ করেননি। সম্রাট আকবরের বন্ধু ও প্রশংসাগীতি রচয়িতা আবুল ফজলই কেবল অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খোরাসানের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর আসল নামও জানা যায় না। তাঁর স্বামী প্রেমভরে তাকে ডাকতেন 'মাহাম' অর্থাৎ আমার চাঁদ।

কোহিনুরের প্রথম মোগল মালিক হওয়ার কথা হুমায়ুনের। কিন্তু তাঁর জন্মের সময় বাবর চূড়ান্তভাবে হিন্দুস্থানের ওপর বিজয় প্রতিষ্ঠা থেকে বহু দূরে ছিলেন এবং এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাঁর চেয়েও বয়সে চার বছরের ছোট এক ব্যক্তির নাটকীয় উপস্থিতিতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই ব্যক্তি পারসিক সাফাভি বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ইসমাইল। তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত হলেও পারস্যের জাতীয়তাবাদী রেনেসাঁর নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর বংশ পরবর্তী সাড়ে আটশ বছরের বেশি সময় ধরে পারস্যের ওপর তাদের প্রভাব বজায় রাখে।

ভেনিসের পরিব্রাজক কেটারিনো জেনো এবং অ্যাংলিওলেলো প্রথম ইসমাইলের ওপর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন : "তিনি অভিজাত বংশোদ্ভূত অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। তরুণীদের মতো মাধুর্যমণ্ডিত, হরিণ শাবকের মতো চঞ্চল। তার চুল সোনালি, কাঁধ প্রশস্ত, দক্ষ তিরন্দাজ এবং দেখতে জন্মগত সহজাত নেতার মতো। তাঁর চিন্তাশক্তি দ্রুত, আচরণ বন্ধুসুলভ এবং মেজাজ ভয়ংকর। তাঁর সৈন্যরা তাকে পূজা করে।"

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এবং শিয়া মতবাদের ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে দশ বছর সময়ের মধ্যে শাহ ইসমাইল পারস্যকে তাঁর পুরানো সীমান্ত পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে তাঁর দুটি শত্রু সৃষ্টি হয় ও পশ্চিম দিকে সুন্নি মতবাদে বিশ্বাসী তুর্কি এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে উজবেকরা। তারা শাহ ইসমাইলকে শুধু তাদের শত্রু হিসেবেই নয় বরং তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলেও বিবেচনা করে।

উজবেকরা যখন খোরাসান শাসন করছিল, তখন থেকেই পারসিকদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তারা মাঝেমধ্যেই পারস্য ভূখণ্ডে হামলা চালাতো। বাবরের পুরানো শত্রু শাইবানি খান শাহের প্রতিবাদে কোনো রকম কর্ণপাত না করায় দুই নেতার মধ্যে শক্তির প্রদর্শন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৫১০ সালের ২ ডিসেম্বর মার্ভের কাছে উভয় সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শাইবানি খান নিহত হন। শাহ ইসমাইল তাঁর মাথার খুলি দিয়ে একটি পানপাত্র তৈরি করে সোনা দিয়ে তা মুড়িয়ে নেন। ঘৃণায় উন্মত্ত শাহ ইসমাইল শাইবানি খানের মাথার চামড়া খড় দিয়ে ভরে তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের কাছে এবং তাঁর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ মিশরের মামলুক সুলতানসহ অন্যান্য সুন্নি শাসকদের কাছে প্রেরণ করেন।

শাইবানি খানের পরাজয়ে বাবর অত্যন্ত উৎফুল্ল হন। ১৫১০ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে তিনি এই খবর পান তাঁর চাচাতো ভাই বাদাখশানের সুবেদার মির্জা খানের পাঠানো এক চিঠির মাধ্যমে। মির্জা খান লিখেন, "আমি স্বয়ং কুন্দুজে গিয়েছিলাম। তুমি কি সেদিকে তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যাবে? তাহলে তুমি তোমার পূর্বপুরুষের রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে এই আশা নিয়ে আমি তোমার সাথে যোগ দেবো।"

বাবর কোনো বিলম্ব করলেন না। কারণ কাবুল তার কাঙ্ক্ষিত স্থান নয়, বরং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি সেখানে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি তখনো তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন সমরকন্দের পানে। তীব্র আফগান শীত উপেক্ষা করে তিনি তুষারাবৃত

হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন তাঁর সঙ্গে ছোট্ট এক সেনাবাহিনী নিয়ে। ১৫১১ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি কুন্দুজ পৌঁছেন। শাহ ইসমাইলের দূত তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে। বাবর অবিলম্বে তাঁর চাচাতো ভাইকে পাঠান পারস্যের শাসককে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এবং উজবেকদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে। কারণ উজবেক বাহিনী তখনো আমু দরিয়ার অপর পাড়ে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে টিকে ছিল। শাহ ইসমাইল বাবরের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কারণ, তিনি অটোমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার পূর্বে তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত নিরাপদ করতে চান। তিনি ঘোষণা করেন যে, ট্রান্সঅক্সিয়ানায় বাবর যেসব ভূখণ্ড অধিকার করবেন সেসব ভূখণ্ডের ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই সন্ধিক্ষণে বাবর বাদাখশান থেকে ট্রান্সঅক্সিয়ানার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তার পাশে অগ্রবর্তী একটি ঘাঁটি হিসার চাদমান দখল করেন। এই সাফল্যে সমরকন্দের সিংহাসন দ্রুত অধিকার করার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। কিন্তু তখনো তাঁর প্রয়োজন ছিল পারসিকদের অতিরিক্ত বাহিনীর সমর্থন। শাহ ইসমাইল বাবরকে প্রয়োজনীয় সৈন্য সরবরাহের সম্মতি দেন।

১৫১১ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে বাবর তাঁর মিত্রদের প্রশংসা ও পুরস্কার সহকারে বিদায় দিয়ে বিজয়ীর বেশে সমরকন্দে প্রবেশ করেন। স্থানীয় লোকজনের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হতো না, যদি তাদের শাসক একজন ধর্মপ্রাণ সুন্নি হওয়া সত্ত্বেও ধর্মদ্রোহী সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তার পূর্বপুরুষের রাজধানীতে ফিরে আসতেন। যাহোক, সমরকন্দের বাসিন্দারা আহম্মক ছিল না। বাবরের সম্পর্কিত ভাই ইতিহাসবিদ মির্জা হায়দার দুগলাতের মতে, সমরকন্দবাসীরা ভালোভাবে জেনে গিয়েছিল যে, বাবর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তবু তারা আশা পোষণ করেছিল যে, বাবর যদি একবার রসুলের আইন মেনে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজ বিশ্বাসে ফিরে আসবেন। কিন্তু শিগ্‌গির তাদেরকে হতাশ হতে হলো। শাহ ইসমাইলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে থাকাকে বাবর নিরাপদ বোধ করলেন না। এতে কাজ হচ্ছিল না। তাঁকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানোর আট মাস পর সমরকন্দের অধিবাসীরা শাইবানি খানের উত্তরাধিকারী ও ভাগ্নে ওবায়দুল্লাহ খানকে বাবরের স্থলাভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, একজন প্রিয় ধর্মত্যাগী ও ঘৃণিত সুন্নির চেয়ে শেষোক্ত ব্যক্তি বরং কম ক্ষতিকর। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাবরকে তৃতীয় বারের মতো সমরকন্দ ত্যাগ করতে হয়।

এই ক্ষতির পর বাবর হিন্দুস্তানের দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরান, যে দেশটির প্রতি কাবুলের প্রায় সকল শাসকই তাদের লোলুপদৃষ্টি ফেলেছিল। বাবরের আগেও বহু মুসলিম বিজয়ী ভারতে অভিযান চালিয়েছেন। তাদের অনেকে অভিযান পরিচালনা করেছেন হিন্দুস্তান লুণ্ঠন করতে, আবার কেউ কেউ সেখানে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন হিন্দুস্থানের সম্পদ ও উর্বরতার লোভ সামলাতে না পেরে।

খাইবার পাস অতিক্রম করে হিন্দুস্থানে বাবরের প্রথম তিন দফা অভিযান ছিল আকস্মিক হামলার আকারে। ১৫২৩ সালে চতুর্থ অভিযানের সময় তিনি লাহোর দখল করেন, যে শহরটি কোনোভাবে তৈমুরের শাসনের অংশ ছিল। তাঁর এ ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিল না। তৈমুর লং পাঞ্জাব ত্যাগ করার আগে সেখানে খিজির খান নামে এক ব্যক্তিকে সুবেদার নিয়োগ করে যান, যিনি সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তারা ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ সাল পর্যন্ত দিল্লি এবং হিন্দুস্তানের উত্তর অংশ শাসন করে। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় আফগান বংশোদ্ভূত লোদিরা। বাবর যখন হিন্দুস্থানে তাঁর ভাগ্য অন্বেষণে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তখন দিল্লির সিংহাসনে ছিল লোদি বংশ।

ক্ষমতাসীন সুলতান ইব্রাহিম লোদি ১৫১৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পিতা সিকান্দার লোদির মৃত্যুর পর। তিনি যে একটি সাম্রাজ্যের চেয়ে একটি রাজ্যসমষ্টির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর সামান্য উপলব্ধি ছিল। তাঁর সার্বভৌমত্ব বিস্তৃত ছিল হিন্দুস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা থেকে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত। আগ্রার নিকটবর্তী ধোলপুর ও চান্দেরী তাঁর অধীনে ছিল, পাঞ্জাবেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত এবং দক্ষিণ দিকে তাঁর প্রভাব ছিল হিন্দুস্থানের মধ্যাঞ্চলের বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব ছিল শুধু প্রতীকী। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হতো শক্তিশালী আফগান প্রধানদের দ্বারা, তাদের অধিকাংশ ছিলেন সুলতানের আত্মীয়স্বজন। যারা ইব্রাহিম লোদিকে সুলতান হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে নামেমাত্র শাসক বলে ভাবত।

প্রথম দুজন লোদি সুলতান বাহলুল ও সিকান্দার লোদি ছিলেন সদাচারী ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং এই নীতিতে পরিচালিত হয়ে তারা তাদের দরবারিদের প্রজার চেয়ে বরং বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতেন।

কিন্তু ইব্রাহিম লোদি তাদেরকে অবমাননা করেন; তাঁর উপস্থিতিতে দরবারিদের হাত আড়াআড়ি করে ভৃত্যসুলভভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেন। তিনি ছিলেন সন্দেহপ্রবণ ও নিষ্ঠুর। কারো ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হলেও ইব্রাহিম তাদের শৃঙ্খলিত করে, বদ্ধ কুঠুরিতে বন্দি করে রাখতেন। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না যে, তাঁর শাসনের প্রধান

সমর্থকরা— যাদের মধ্যে পাঞ্জাবের সুবেদার দৌলত খান লোদিও ছিলেন, তিনি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। ইব্রাহিম তাঁকে আগ্রায় তলব করেন। কিন্তু প্রাণের ভয়ে তিনি নিজে আগ্রায় না গিয়ে তাঁর পুত্র দিলাওয়ার খানকে পাঠান। তরুণ পুত্র রাজধানীতে পৌঁছামাত্র ইব্রাহিম লোদি হুমকি প্রদান করেন যে, তাঁর পিতা যদি উপঢৌকনসহ পাঞ্জাব থেকে সশরীরে তাঁর দরবারে হাজির না হন, তাহলে তাঁকে কুখ্যাত কারাগারে আটকে রাখা হবে। দিলাওয়ার কোনোমতে আগ্রা থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং তাঁর পিতাকে সতর্ক করেন যে, তিনি যদি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে তাঁকে পরাভূত হতে হবে। দৌলত খান কালবিলম্ব না করে কাবুলের শাসক বাবরকে অনুরোধ জানান তাঁকে সাহায্য করতে।

বাবর ১৫২২ সালে কান্দাহার পুনর্দখল করেছিলেন তাঁর পশ্চিম সীমান্তকে নিরাপদ রাখার জন্য। দৌলত খানের প্রস্তাবে তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানান। দৌলত খানের অনুরোধে ইব্রাহিম লোদির আপন চাচা আলম খানও সাড়া দেন, যার ওপর লোদি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনটি সংক্ষিপ্ত অভিযানের পর আফগান পক্ষত্যাগীদের সাহায্য করতে বাবর ১৫২৩ সালে ভারতে চতুর্থ দফা হামলা চালান। এর ফলে তাঁর নিজের ভারত জয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে বাবরের পরিবার আরও বর্ধিত হয়েছে তিনটি পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে। তাঁরা হচ্ছেন, কামরান (১৫০৯), আসকারি (১৫১৬), হিন্দাল (১৫১৯), গুলবদন বেগম (১৫২৩)। ১৫২০ সালে হুমায়ুনের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন তাঁকে বাদাখশানের সুবেদার নিয়োগ করা হয়। ভারত অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য পিতা কর্তৃক আহ্বান জানানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

১৫২৫ সালের ২৫ নভেম্বর বাবর 'বাগ-ই-ওয়াফা' (বিশ্বস্ততার উদ্যান) পৌঁছেন। এই উদ্যান কাবুলের চারপাশে তাঁর গড়ে তোলা অসংখ্য উদ্যানের একটি। সেখানেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন বাদাখশানের বাহিনী নিয়ে। হুমায়ুনের জন্য অপেক্ষার সময়ে বাবর তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে মদ ও আফিম সেবন করে কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধৈর্য ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। হুমায়ুন তেমন তাড়া অনুভব করছিলেন না। একমাত্র আল্লাহই জানতেন যে, তাঁর ভাগ্যে কী আছে। তিনি কি তাঁর রাজ্যকে অর্ধ-স্বাধীন অবস্থায় ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন? অথবা তিনি কি তাঁর পিতার উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন? ১৫২৫ সালের ৩ ডিসেম্বর হুমায়ুন কাবুলে পৌঁছেন। বাবর লিখেছেন, 'আমি তাকে

অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করি।' অবশেষে তারা তাদের অভিযানে রওয়ানা হন।

১৫২৬ সালের ১২ এপ্রিল মোগল সেনাবাহিনী পানিপাতের উপকণ্ঠে পৌঁছে বিস্তীর্ণ সমভূমিতে শিবির স্থাপন করে। মরুময় পরিবেশের মৃত্যুসম স্তব্ধতার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘাস ও কণ্টকযুক্ত গাছের ঝোপ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না। জীবনের নিশানা বলতে ওটুকুই ছিল এবং পানির দুষ্প্রাপ্যতা ছিল সীমাহীন।

পানিপাতে পৌঁছে বাবর তাঁর শিবিরের আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। শিবিরের ডানদিকে পানিপাত শহর, বামদিকে শিবিরের মুখোমুখি কয়েকশ গরুর গাড়ি কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে একটির সাথে আরেকটিকে যুক্ত করা হয়। প্রতি দুটি গাড়ির পর দাঁড় করানো হয় মশালধারী ও পদাতিক সৈন্যদের। এর মাঝে মাঝে ফাঁকা স্থান ছিল একশ' থেকে দেড়শ' অশ্বারোহী সৈন্যের চলাচলের জন্য।

এই প্রথমবার বাবর এত বড় একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা বারো হাজার। ইব্রাহিম লোদির বাহিনীর তুলনায় তাঁর বাহিনীর আকার খুব ছোট। ইব্রাহিমের বাহিনীতে ছিল এক লাখ সৈন্য এবং যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতির সংখ্যা ছিল একহাজার। কিন্তু বাবরের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল শক্তিশালী, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তুর্কি গোলন্দাজরা, যারা এশিয়ায় সেরা গোলন্দাজ বলে বিবেচিত। বিশেষ করে ১৫১৪ সালে চালদ্রিয়ানের যুদ্ধে অটোমান বাহিনীর হাতে শাহ ইসমাইল সাফাভির শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত হবার পর তুর্কি গোলন্দাজদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৫২৬ সালের ২০ এপ্রিল শুক্রবার ভোরে হিন্দুস্তানি বাহিনী বাবরের অবস্থানের ওপর হামলা চালায়। মোগল অশ্বারোহীদের তাদের অবস্থান থেকে বের করতে কয়েকদিন লেগে যায়। এ সময়ে বাবরের বাহিনী গতানুগতিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করছিল— ডান, বাম ও মধ্যবর্তী অবস্থান, অগ্রবর্তী বাহিনী, সংরক্ষিত বাহিনী, দুভাগে বিভক্ত অশ্বারোহী বাহিনী— একটি ডানদিকে, আরেকটি বামদিকে। অর্থাৎ, শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলার জন্য রচিত হয়েছিল এই কৌশল।

ডানদিকের বাহিনীর নেতৃত্ব হুমায়ুনের ওপর। অতএব তাঁর ওপরই আসে শত্রুবাহিনীর হামলার প্রথম ধাক্কা। অবিলম্বে সংরক্ষিত বাহিনী পাঠানো হয় তাঁকে সাহায্য করতে। অপরদিকে বাবরের অশ্বারোহীরা ইব্রাহিম লোদির বাহিনীর ওপর তির বর্ষণ করতে থাকে। এ সময়ে তৎপর হয়ে ওঠে